হয় ব্রহ্মরাজ থিবোর কাছে। কিন্তু বর্মীরাজ মধ্যস্থতায় রাজি না হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজতন্ত্রের কাছে চরমপত্র পাঠান হয়, যাতে বর্মার আভ্যন্তরীন নীতি, বাণিজ্য, প্রভৃতির সঙ্গে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। স্বভাবতই ব্রহ্মরাজ এই চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন এবং শুরু হল তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮৮৫ সালে। ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয় অধিকার করে ব্রহ্মরাজ থিবো পত্নী সহ ভারতে নিবাসিত হন। এইভাবে কোনবঙ রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ এক ঘোষণায় ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী মান্দালয় পরিবর্তে রেঙ্গুনে স্থাপিত হয়।

তবে ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানকার দুর্ধর্ষ উপজাতি শান, মোন, কারেন কোন বিদেশী নিয়ম মানতে রাজি ছিল না। তাই ব্রহ্মের উত্তরভাগে গোলযোগ চলতেই থাকে।

৬৬.৬ মালয়ী রাজ্যে উপনিবেশিকতার সূচনা

উপনিবেশিবাদ শুরু হবার পূর্বে মালয়ী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই বিবেচিত হত। মালয় দ্বীপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সুলতান শাসিত অঞ্চল। উপনিবেশিকতার যুগে মালয় দ্বীপের বোর্নিও উত্তরাঞ্চলের এবং পূর্ব সুমাত্রায় স্থাপিত হয়েছিল ডাচ বা ওলন্দাজদের শাসন। মালয়ী দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের ভ্যাসাল (Vassal—সামন্ত) সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। থাইল্যান্ডের রাজাদের সঙ্গে এবং দক্ষিণভাগের সুলতানী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এইভাবে গঠিত ছিল ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্য।

মালয়ী দ্বীপে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ ছিল অনেকটাই ধীরগতি সম্পন্ন এবং খুব বিচ্ছিন্ন। ষোড়শ শতকের প্রথমে পর্তুগীজ, সপ্তদশ শতকে ডাচ বা ওলন্দাজরা এবং পরে ব্রিটিশরা এখানে একের পর এক আসতে থাকে প্রধানত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখা এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বাণিজ্যপথ (Trade route) প্রতিষ্ঠা করা।

ইউরোপে সংঘটিত যুদ্ধগুলি সর্বদাই এশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে।

৬৬.৬.১ ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ডাচ আধিপত্য

ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইঙ্গো-ডাচ সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই উপমহাদেশের যে সব অঞ্চলে ওলন্দাজ আধিপত্য রয়েছে সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে। জাভায় একজন ওলন্দাজ প্রশাসক মার্শাল হেরম্যানকে পাঠান হয় ১৮০৮ সালে। তিনি কিছু প্রগতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করলেও ক্রমে তা জাভাবাসীর মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। ১৮১০ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি আমবোনিয়া সুরকারতা, জাকার্তার সুলতান পদের বিলোপ সাধন করে এই তিনটি পরস্পর বিরোধী সুলতানী রাজ্যকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি জাভাকে নয়টি এককে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি এককে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এই কর্মচারীরা ছিলেন

ডাচ কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীতে। সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ী সাম্রাজকে পত্যক্ষ ডাচ শাসনাধীন করা।

৬৬.৬.২ ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া

এইভাবে ওলন্দাজ প্রশাসন ধীরে ধীরে জাভায় সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে থাকলে তা ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার জাভা অধিকার করতে মনস্থ করেন এবং ১৮১১ সালে তদনীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো জাভা দখল করতে অভিযান প্রেরণ করেন। খুব সহজেই জাভা অধিকৃত হয়। জাভা তথা ইন্দোনেশিয় মালয়ী সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব টমাস স্টানফোর্ড র‍্যাফেলস (Thomas Stanford Raffles)-কে দেওয়া হয় ও র‍্যাফেলস জাভার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন (১৮১১—১৮১৬)।

৬৬.৬.৩ ব্রিটিশ গভর্ণর র‍্যাফলসের ভূমিকা

মালয় দ্বীপের পেনাং-এ ১৮০৫ সালে গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন র‍্যাফেলস। মালয়ী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এছাড়া স্থানীয় রীতি প্রথা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছিল। এই কারণে লর্ড মিন্টো ১৯০৭ সালে র‍্যাফেলস্‌কে মালয়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। স্থানীয় ভাষা জানার ফলে তিনি ডাচ শাসনাধীন জাভাবাসীকে তাদের অসুবিধা বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদের ব্রিটিশ সমর্থকে পরিণত করেন। জাভা অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর রণকৌশল ও তথ্যাদি ভারত সরকারে কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। র‍্যাফেলস-এর এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা নিরূপণ করতে সাহায্য করেছিল। র‍্যাফেলসের মতে, ওলন্দাজ শাসন ছিল যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ও প্রজাপীড়ক তাই এখানে ব্রিটিশ প্রশাসনিক চরিত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। মালয়ী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্রিটিশ নিরাপত্তার প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কঠোর না হয়। মালয়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি দ্রুততর হয়। ফলে জনসমর্থনের ভিতর দিয়ে এখানকার মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে। তিনি বুঝেছিলেন মালয়ী সম্পদকে ব্রিটিশ উৎপাদকদের জন্য ভান্ডারে পরিণত করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনের ব্যাপক সংস্কারের, যে সংস্কার কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। কাজেই মালয়ী জনগণের উপযোগী সংস্কার গৃহীত হল, অবশ্যই তা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রয়োজনে। র‍্যাফেলস যে সংস্কারগুলি নিয়ে এলেন তা ছিল যথেষ্টই সুদূর প্রসারী। র‍্যাফেলস এখানে প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করলেন। বংশানুক্রমিক স্থানীয় শাসকদের বেতনভোগী আমলা শ্রেণীতে পরিণত করলেন। তাদের কঠোরভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনিক আওতায় আনা হয়। মালয় দ্বীপকে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধরনে জেলা বিভাগ ও গ্রামে বিভক্ত করা হয়। ওলন্দাজ শাসনের অযথা কঠোর ব্যবস্থাগুলি রহিত করা হয়। র‍্যাফেলস্‌ মুক্ত উদ্যোগে (free enterprise) বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি জবরদস্তি যোগান ব্যবস্থাকে তুলে দিলেন। শুধু প্রেয়াংগার জেলার কফির চাষ ও যোগানের ক্ষেত্রে তা অব্যাহত রইল।

এই প্রথম কৃষকশ্রেণীকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হল। তারা তাদের পছন্দানুযায়ী শস্য উৎপাদন করতে পারবে বলা হল। ভারতীয় রীতি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার এইসব জমিতে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। এখানে র‍্যাফেলস্ মাদ্রাজের লেফটানেন্ট কর্নেল কলিন ম্যাকেঞ্জীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। মাদ্রাজের রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় উৎপাদক যে জমির মালিক হতেন সেই জমির বার্ষিক খাজনা তাকে সরকারকে দিতে হত। র‍্যাফেলস্ ঘোষণা করেছিলেন সরকার হলেন সব জমির মালিক। জমির উর্বরতা অনুসারে কর ধার্য হবে। তাই উর্বর জমি কৃষককুল উৎপাদনের মূল্যের অর্ধ শতাংশ এবং অল্প উর্বর জমির উৎপাদক তার উৎপাদিত মূল্যের এক-চতুর্থাংশ কর হিসাবে সরকারকে দেবে। এইভাবে জমির করদানের মধ্যে দিয়ে উৎপাদক ও কৃষক সমাজ জবরদস্তি যোগানের হাত থেকে রেহাই পায়। জবরদস্তি শ্রম, যোগান এবং আকস্মিক যোগান প্রভৃতি ছিল ওলন্দাজ শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ প্রশাসনাধীন মালয়ী সমাজ এই অন্যায় ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি পায়।

৬৬.৬.৪ র‍্যাফেল্সের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি

ব্রিটিশ সরকার র‍্যাফেলসের নেতৃত্বে যে ব্যবস্থা মালয়ে গ্রহণ করলেন তার ফলাফল ছিল দুই ধরনের প্রথমত, সরকার এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন একই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম একক গ্রামসমাজের সঙ্গে তার সংযোগ রইল; দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার উৎপাদক, কৃষকদের জন্য বাজার উন্মুক্ত হল। তার ফলে নিজ পণ্য বিক্রয় করে কৃষকশ্রেণীর হাতে অর্থ আসতে লাগল যা দিয়ে তারা অন্য কোন ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারল।

J.S. Furnivall বলেছেন র‍্যাফেলসের মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড সাধারণ জনতাকে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল; তাঁর বাস্তববাদিতা কৃষকদের হাতে অর্থ এনে দিয়েছিল, যাতে তারা ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্য কিনতে পারে।

একথা সত্য যে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সকলেরই প্রয়োজন ছিল বাণিজ্যিক কাঁচামালের কিন্তু ব্রিটেনে প্রস্তুতপণ্য ছিল, বিশেষত বস্ত্র খুবই সস্তা। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে উপনিবেশে সরবরাহ করত। ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের কাছে এই রপ্তানি ব্যবসা সস্তা দামের কারণে তাই খুব লাভজনক হয়ে যায়।

৬৬.৬.৫ তাঁর নীতির সীমাবদ্ধতা

তবে র‍্যাফেলসের সংস্কার ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং সর্বত্র সফল ছিল তাও বলা যায় না। প্রথমত, পুরানো **regent** কে সরিয়ে যে সব গ্রামপ্রধানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা অনেক সময়ে অন্যায়-অবিচার করতেন গ্রামবাসীর উপর। দ্বিতীয়ত, সরকারকে নগদ অর্থে কর দেবার রীতি চালু হওয়াতে নগদ অর্থের জন্য স্থানীয় জনগণ কৃষককুল চীনা মহাজন ও সুদ ব্যবসায়ীদের কাছে দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। চীনা মহাজনদের সুদের হার ছিল খুবই চড়া। কারণ ইতিপূর্বে তারা চাল প্রভৃতি উৎপাদিত পণ্যে করদান করে এসেছে। নগদ অর্থ তাদের

কাছে কখন ছিল না। অথচ সরকারি কুঠি (Residency Head-quarters)— গুলিতে নগদ অর্থে তাদের কর প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রামের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জমি বন্টনের ব্যাপারে কোন রূপ সরকারি পরিদর্শন নীতি চালু ছিল না। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর অপ্রতুলতা ছিল তাই উৎপাদক বা কৃষকশ্রেণী ঠিক কি ধরনের জমি লাভ করছে বা জমি বন্টনের কিরূপ হবে— তা নির্ধারণের জন্য কোন সরকারি নীতি গৃহীত হয়নি বলে কৃষকশ্রেণী গ্রামপ্রধানের সালিশীর উপরই নির্ভরশীল ছিল। কাজেই গ্রাম প্রধানের ইচ্ছা ও বিবেচনাবোধের উপর কৃষকরা নির্ভর করতে থাকে।

চতুর্থত, র‍্যাফেলস পণ্যের বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেননি। কারণ যে সব জেলাগুলিতে বাধ্যতামূলক পণ্য উৎপাদন বজায় ছিল, যেমন প্রেয়াংগারের কফি চাষ সেখানে প্রাচীন রীতি বজায় রাখা হয়েছিল অর্থাৎ জবরদস্তি উৎপাদন ও যোগান ব্যবস্থা কফি, কাঠ উৎপাদক জেলাগুলিতে বহাল রইল।

তবে তিনি স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। অনেকগুলি উৎপীড়নমূলক বাণিজ্যকর তিনি তুলে দিয়েছিলেন। মালয় উপদ্বীপের পূর্বভাগে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য নৌ-বাহিনী তৈরি করেছিলেন। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এখানে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্থানীয় বিচার পরিচালনার জন্য স্থাপিত হয় ষোলটি বিচারালয় (Land courts) যার বিচারপতি হলেন রেসিডেন্ট ও স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা সভ্য পেলেন। ছোট ছোট দেওয়ানী ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি এখানে করা হত, পুলিশী বিচার হত, এছাড়া কোন মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে লেফটানেন্ট গভর্ণরের অনুমোদন জরুরী ছিল। এখানে জুরী দ্বারা বিচারের ব্যবস্থাও ছিল। যদিও এই ব্যবস্থা সমালোচিত হয়েছিল তবুও বলা যায় জুরী ব্যবস্থা ছিল "typical British institutions to absolutely foreign soil..." ইতিমধ্যে ১৮১৪ সালের পর ইউরোপে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে থেকে হল্যান্ডকে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাই ডাচ উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সরিয়ে সেখানে ওলন্দাজ বা ডাচদের পুনস্থাপন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশেও ফরাসি প্রতিপক্ষ রূপকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা দেখা গেল।

১৮১৪ সালে র‍্যাফেলস লণ্ডনে চলে যান এবং ইন্দোনেশিয়া-মালীয় উপদ্বীপের অঞ্চলগুলিতে পূর্বেকার ওলন্দাজ আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে র‍্যাফেলস পুনরায় লেফটেনান্ট গভর্নর হয়ে এলেন বেনকুলেন অঞ্চলে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রার অখ্যাত এক বাণিজ্য অঞ্চল। ইতিমধ্যে মালয়ী উপদ্বীপে ডাচরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

৬৬.৭ মালয়ী রাজ্যে ওলন্দাজ পুনরভ্যুত্থান

কিছু জায়গায় নতুন ওলন্দাজ বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ওলন্দাজরা ব্রিটিশ বাণিজ্যকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং বাটাভিয়া (জাকার্তা) ছাড়া অন্য কোথাও ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এই অবস্থায় র‍্যাফেলস ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারকে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিপদ সম্পর্কে সচেতন বাণিজ্যক আধিপত্য থাকবে এবং যেখান থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য এবং কর্তৃত্ব দুটিরই মোকাবিলা করা যেতে পারে। কারণ ওলন্দাজদের হাতে মালাক্কা প্রণালী থাকার ফলে প্রতিদিনই এই উপদ্বীপ অঞ্চলে ডাচ আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

৬৬.৭.১ সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠা

এখানে উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডের মধ্যে তথাকথিথ মিত্রতাকে বিনষ্ট করতে চায়নি। র‍্যাফেলস চেয়েছিলেন রিহো (Rhio) দ্বীপে ব্রিটিশ প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করতে কিন্তু এখানে পূর্বেই ডাচরা চুক্তির মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর তাঁর দ্বিতীয় পছন্দ ছিল জোহর দ্বীপের সিঙ্গাপুর গ্রামটি। সিঙ্গাপুর ছিল মালয়ী জাতি অধ্যুষিত মৎসজীবীদের একটি চোটি গ্রাম। র‍্যাফেলস এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি (factory) খোলার বা স্থাপনের অনুমতি পান। সিঙ্গাপুর জোহর (Johore) রাজ্যের একটি অংশ ছিল এবং এখানে ১৮২২ সাল থেকে সুলতানের মৃত্যুর পর থেকে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। মৃত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিতাড়িত হয়ে সিঙ্গাপুরের নিকটস্থ বুলাং (Bulang) দ্বীপে ছিলেন এবং সুলতান পুত্রের প্রতি সিঙ্গাপুর, তেমেংগং (Temenggong) অঞ্চলের মালয়ী বাসীর সমর্থন ছিল। র‍্যাফেলস ছিলেন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক। যিনি সুরতানপুত্রকে সিঙ্গাপুরে আমন্ত্রণ জানালেন এবং জোহোরের সুলতান রূপে তাকে স্বীকার করে নিলেন। ১৮১৯ সালে সুলতান হুসেনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয় ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব বৈধতা লাভ করে।

৬৬.৭.২ সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব

সিঙ্গাপুরের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। মালয়ী উপদ্বীপের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত এই বন্দরটি ইউরোপ ও চীনের মধ্যে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করুক, যা এতদিন ধরে ব্রিটিশরা আকাঙ্খা করে আসছিল। ইতিপূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে জাহাজকে আসতে হত কিন্তু সিঙ্গাপুরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এরপর থেকে সম্পূর্ণ যাত্রাপথের এক হাজার মাইল দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একই সঙ্গে প্রাচ্যে ডাচ একাদিপত্যকে প্রতিহত করার জন্য সিঙ্গাপুরের উত্থান সম্পূর্ণ হল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পশ্চিমের মাল্টা দ্বীপের ক্ষেত্রে। তেমনভাবে পূর্বে সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা করা হল।

খুব স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থাকে ওলন্দাজরা মেনে নিতে পারেনি। তারা সুলতান হুসেনের সঙ্গে সম্পাদিত

১৮২৪ সালে ইঙ্গো-জোহর চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। তাঁদের মতে সুলতান হুসেনের কোন রাজনৈতিক বৈধতা নেই। এছাড়া ওলন্দাজদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই ১৮১৮ সালে রিহো অঞ্চলের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যাতে জোহর রাজ্যের সিঙ্গাপুরের উপর স্বাভাবিক ভাবেই ডাচই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই নতুন করে ১৮১৯ এর সম্পাদিত ইঙ্গো-জোহর (তথা সিঙ্গাপুর) চুক্তির কোন বৈধতা নেই। তাই সিঙ্গাপুরকে ডাচদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে ১৮১৯ সালের পর থেকে সিঙ্গাপুরের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় দশগুণ। একবছরের মধ্যেই এখানকার অগ্রগতি, যা ব্রিটিশদের চুক্তির ফলে শুরু হয়েছিল, দূর-দূরান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। সিঙ্গাপুর বন্দরটি ছিল খুবই উৎকৃষ্ট এক বন্দর। এখান থেকে পরিচালিত হত মুক্ত বাণিজ্য। এখানে ছিল শক্তিশালী ও সুরক্ষিত উন্নত সমুদ্র বাণিজ্য। সিঙ্গাপুরের সামরিক সুরক্ষা ও তৎকালীন সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল বহু মানুষকে এখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী করে তুলেছিল। এখানে বাণিজ্য, ইনসুরেন্স, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা নৌপরিবহন প্রভৃতির ভারতীয় ও সিংহলী শাখা চালু করা হয়েছিল।

এইভাবে প্রতিবছর সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অবস্থিতি শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে চলেছিল। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সমৃদ্ধি ওলন্দাজদের কাছে সুখবর ছিল না। মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ওলন্দাজরা প্রস্তুত হতে থাকে। তবে ব্রিটিশদের কাছে এই সময়টি ছিল সংহতিকরণের পর্যায়কাল তাই অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ব্যয়ভার বাড়ানোর ইচ্ছে তাদের ছিল না।

৬৬.৭.৩ ১৮২৪ সালের চুক্তি ও মালয়ী রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা লাভ

১৮২৪ সালে নেদারল্যান্ড ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে পুনরায় কোন যুদ্ধজালে জড়িয়ে না পড়ে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নেদারল্যান্ড মালক্কা ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করে নেয়। এছাড়া উভয় রাষ্ট্রই একে অন্যের বন্দর থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে নৌপরিবহন করবে স্থির হয়।

১৮২৪ সালের এই চুক্তির ফলে মালয়ী উপদ্বীপ থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রত্যাহৃত হলে ব্রিটিশ প্রভাব, আধিপত্য স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ কর্তৃত্ব ব্রিটেন মেনে নেয়। এইভাবে ইন্দোনেশিয়া-মালয়ী সাম্রাজ্য দুটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের পৃথক প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়।

৬৬.৭.৪ ১৮২৪ সালের পরবর্তী সমস্যাগুলি

১৮২৪ সালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশের পক্ষ থেকে একরকম 'না হস্তক্ষেপ' নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে সরকারি কর্মচারী এবং বণিকগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে সরকারে উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে মালয় দ্বীপে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৮৫০ সালের পর থেকে টিনের খনিগুলিতে সিঙ্গাপুর ও পেনাং এর চীনা,

ইউরোপীয় বণিকরা অর্থ লগ্নি করছিল। এই বণিকগোষ্ঠী মালয়ী খনিজ ভাণ্ডার ও সম্পদ সম্পর্কে যথেষ্টই ধারণা রাখত। অন্যদিকে মালয় দ্বীপে রাজনৈতিক স্থিরতা ছিল না। বিভিন্ন সুলতানী রাজ্যগুলিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকত। প্রতিটি রাজ্য একে অন্যাকে ঈর্ষা করত, চোরাচালান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জলপরিবহন সুরক্ষিত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যে সব বণিকরা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেগুলিতে অর্থ লগ্নি করেছিল তারা চাইছিল বর্ধিত হারে লাভের অর্থ ফেরৎ পেতে কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাদের বাণিজ্যিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল তাই ব্রিটিশ সরকারের উপর বণিকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চাপ আসতে থাকে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য প্রসারণের জন্য।

এছাড়া যেসব চীনা শ্রমিক কাজ করত তারা সবাই গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল। খনি ব্যবসায়ের সিংহভাগ ছিল চীনা বণিকদের হাতে। এই বণিকরা চীনের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড ইত্যাদি মালয়ে চীনা ও ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। চীনারা বেশিরভাগ সময়ে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার লড়াই ও ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করত। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত দুবছর সময়কালে পেরাক (Perak) অঞ্চলের নৈরাজ্য রাজতান্ত্রিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতি অর্থাৎ ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছিল সেই পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটজনক করে তোলে। ফলে ১৮২৪ সালে মালয়ী সুলতানদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে চুক্তি বা বন্দোবস্ত হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে সর্বত্রই, বিশেষ করে পেনাঙ অঞ্চলে।

৬৬.৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে টিনের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকায় এই সময় চলছিল গৃহযুদ্ধ। সামরিক প্রয়োজনে টিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেল মজুদ রাখারজন্য পিপা তৈরির কারণে টিনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া সৈন্য চাউনির জন্য বড়ো টিনের পাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে টিন সরবরাহ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে এই খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিলে তারা সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করে মালয়ী টিন খনিগুলির উপর, যেখানে চীনাদের একাধিপত্য ছিল। এই কারণে আকস্মিকভাবে টিনের গুরুত্ব বেড়ে গেলে এই ধাতুটি সরবরাহের জন্য একটা চাহিদা সৃষ্টি হয় ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরে বণিকদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে।

ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের উন্মোচন (১৮৬৯ সালে) ভারত-ব্রিটেনের দূরত্বই নয় ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কম করেছিল। ১৮৭১ সালে সিঙ্গাপুরে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছিল, নৌপরিবহনে উন্নতি এসেছিল, বাষ্পীয় জাহাজ চলতে শুরু করেছিল ফলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে মালয়ী উপদ্বীপ তথা সিঙ্গাপুরের ও বাকি সমুদ্র বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ সালে মলুক্কাস অধিকার করে নেয়

ওলন্দাজরা। ১৮৫৯ সালে কোচিন-চীনে এবং ১৮৬২ সালে কম্বোডিয়াতে ফরাসি আধিপত্য ও প্রোটেক্টরেট স্থাপিত হয়।

মালয়ী উপদ্বীপের নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও বাণিজ্য ব্রিটিশ বণিকদের আশংকার কারণ হয়ে ওঠে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়ে যাবার পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার সনদে ভারত সহ ব্রিটেনের অন্যান্য সহ উপনিবেশগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ প্রশাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৮২৪ সালের বন্দোবস্তের ফলে যে সব দ্বীপগুলিতে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয়েছিল [যেমন পেনাং, মালাক্কা, ওয়েলসলী প্রদেশ (Province Wellesley) সিঙ্গাপুর—ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে একত্রে Straits Setlements বলা হত] সেইসব অঞ্চল ১৮৬৭ সাল থেকে ইন্ডিয়া অফিস কর্তৃক শাসিত হতে থাকে।

৬৬.৭.৬ মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা

বস্তুতপক্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থ, মালয়ের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও তৎকালীন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারে নীতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আসে। ১৮৭৩ সালে মালয়ের গভর্নর স্যার হ্যারি অড (Sir Hary Ord) বণিক সম্প্রদায় ও উপনিবেশিকদপ্তরের চীনা প্রতিনিধিদের স্বপক্ষে আবেদন জানালেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তাঁর পরবর্তী গভর্নর এ্যান্ড্রু ক্লাক (Sir Andrew Clarke)-কে মালয়ের ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা দিতে পাঠান হলে তিনি মালয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দমন করেন। পেরাক, সেলাংগোরের গৃহযুদ্ধ দমন করেন। ১৮৯৫ সালে জোহের (Johore) অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট স্থাপিত হয়। এই বছরই পোরাক, সেলাংগোর পেহাং, নেগ্রিসেমবিলাম— এই চারটি অঞ্চল নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করাহয় একজন রেসিডেন্ট জেনারেলের অধীনে। এই রেসিডেন্ট জেনারেলের অফিস স্থাপিত হল কুয়ালালামপুরে। এই কুয়ালালামপুরই বর্তমান আধুনিক মালেশিয়া বা মালেশিয়ার রাজধানী। চারটি রাজ্য নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হলেও তা ছিল রেসিডেন্ট জেনারেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশদেরই কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। তাই বলাহয় ফেডারেটেড মালয় রাষ্ট্র "...not a nation but an amalgamation".

৬৬.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে উপস্থিত করা হয়েছে ব্রহ্ম দেশ ও ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ক্রমিক পর্যায়ে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। চতুর্দশ পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া [illegible] দেশ ইউরোপীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এখানে আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ প্রস্তুত করে নেওয়া। বর্মার ক্ষেত্রে

দেখা গেল ইংরেজরা এখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করতে ততটা আগ্রহী ছিল না। পরে ভারতে আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে চীনের উপর প্রভূত্ব বিস্তারের প্রয়াস পরিচালিত হল পেগু, আরাকান, তেনাসেরিমের উপর দিয়ে। এইভাবে ইঙ্গো-ব্রহ্ম রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হলো। বর্মায় সম্ভাব্য ফরাসি আধিপত্য প্রতিহত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল ব্রিটিশরা তেমনই মালয়ী রাজ্যে ডাচ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ প্রসারণ শুরু হল।

শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি দুটি রাষ্ট্রে উপস্থিত ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় নিজ স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ পরিচালিত করেছিল। বণিকশ্রেণীর অকারণ ভীতির কারণে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য দুটি রাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের শিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়।